মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

অনন্ত বিজয়

"পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি সৃষ্টির পর মানুষ একসময় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব 'ঈশ্বর-বন্দনা' ছেড়ে দিয়ে ঘোর পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়েছিল; লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ আর অপরাধ-প্রবণতার কারণে ভুলে গিয়েছিল মহান সৃষ্টিকর্তাকে। মনুষ্যজাতির এই অধঃপতন দেখে বিচলিত বোধ করলেন ঈশ্বর, ক্রুদ্ধ হলেন তাঁর সৃষ্টির ওপর। মনে-মনে সংকল্প আটলেন—এই পাপ এবং পাপী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ধ্বংস করে ফেলতে হবে সৃষ্টিজগৎ, নূতন করে ধরণীকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন প্লাবন, এক মহা-মহাপ্লাবন; যে প্লাবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল দুনিয়ার সমস্ত পাপী, ধ্বংস হয়েছিল সকল পাপের বিষ, এমন কী আমাদের চিরচেনা-মায়াবী এই জীবজগতও। তবে সৃষ্টিকর্তা শুধু বাঁচালেন হযরত নুহ্* ও তাঁর পরিবার এবং সঙ্গী-সাথীদের। পরবর্তীতে তাঁদের মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাণের বিস্তার ঘটালেন পৃথিবীতে। আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা আজ সেই হযরত নুহের বংশধর।"—সারসংক্ষিপ্ত করলে প্রায় এই ধরনের পৌরাণিক কাহিনীর অস্তিত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগাঁথা, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে রয়েছে। লোকগাঁথা বা পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনাকে আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা অবাস্তব কেচ্ছাকাহিনী বা শুধু গল্প হিসেবে মেনে নিলেও, ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনাকে 'সত্য' হিসেবেই বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মানুষ; আজন্ম লালিত তাদের পবিত্র 'বিশ্বাসের' কারণে 'কেচ্ছাকাহিনী' বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এটা সত্য যে, এই মহাপ্লাবনের কাহিনী দীর্ঘদিন আপামর সাধারণ মানুষের মনে (বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের মনে) 'সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের লীলা বা প্রতিশোধ' হিসেবে বিরাজমান ছিল। যার ফলে নানা সময়ে প্রখ্যাত এই লোকগাঁথাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (যেমন বিবর্তনবাদ) প্রমাণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিবর্তনবাদের প্রবক্তা খোদ চার্লস ডারউইন থেকে শুরু করে ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল, চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিসহ আরো অনেকেই এই মহাপ্লাবনের বিপক্ষে নানা প্রমাণ হাজির করে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপরও পশ্চিমাদের পবিত্র বিশ্বাসের মিশেল দেয়া 'অর্ধসত্য আর অর্ধমিথ্যার কৃষ্ণগহ্বর' থেকে বেরিয়ে এসে 'পূর্ণসত্যে'র সন্ধান লাভ সহজ হয়নি; দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে হয়েছে। যাহোক, আমরা এ প্রবন্ধে পশ্চিমাদের জ্ঞান অন্বেষণের ইতিহাসে না ঢুকে, মহাপ্লাবনের সম্ভাবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব এবং মহাপ্লাবনের প্রেক্ষাপট বোঝানোর জন্য কিছু লোকগাঁথার কাহিনী উল্লেখপূর্বক প্রচলিত কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরব। তবে আগেই উল্লেখ করা ভালো, আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে 'মহাপ্লাবনের' সত্যতা নির্ণয়ে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো সম্ভব না; আমাদের এই অক্ষমতা কিংবা রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মহাপ্লাবনের পৌরাণিক কাহিনীকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের জন্য অংকের আশ্রয় নিতে হবে। কী উত্তর বের হয়ে আসে, তা একটু পরেই দেখতে পাব।

হযরত নুহ (আঃ) ও মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তথ্য

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেলে'র ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) অন্তর্গত তৌরাত শরিফে হযরত নুহ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : লামাকের একশো বিরাশি বছর বয়সে তাঁর একটি ছেলের জন্ম হল। তিনি

* হিব্রু উচ্চারণে নোয়া (Noa) এবং আরবি উচ্চারণে নুহ্ (Nuh)

বললেন, "আমাদের সব পরিশ্রমের মধ্যে, বিশেষ করে মাবুদ মাটিকে বদদোয়া দেবার পর তার উপর আমাদের যে পরিশ্রম করতে হয় তার মধ্যে এই ছেলেটিই আমাদের সান্ত্বনা দেবে।" এই বলে তিনি তাঁর ছেলের নাম দিলেন নুহ্। নুহের জন্মের পর লামাক আরো পাঁচশো পচানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরো ছেলেমেয়ে হয়েছিল। মোট সাতশো সাতাত্তোর বছর বেঁচে থাকার পর লামাক ইন্তেকাল করলেন। (পয়দায়েশ/ Genesis, ৫:২৮-৩১)

মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানি খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল খারাপির দিকে ঝুঁকে আছে। এতে মাবুদ অন্তরে ব্যথা পেলেন। তিনি দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব; আর তার সঙ্গে সমস্ত জীবজন্তু, বুক-হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখিও মুছে ফেলব। এইসব সৃষ্টি করেছি বলে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নুহের উপরে মাবুদ সন্তুষ্ট রইলেন। (পয়দায়েশ, ৬:৫-৮)

এই হল নুহের জীবনের কথা। নুহ একজন সৎলোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খাঁটি। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল। সাম, হাম, ইয়াফস নামে নুহের তিনটি ছেলে ছিল। সেই সময় আল্লাহর কাছে সারা দুনিয়াটাই গুনাহর দুর্গন্ধে এবং জোর-জুলুমে ভরে উঠেছিল। আল্লাহ দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়ার মানুষের স্বভাবের পচন ধরেছে। (পয়দায়েশ, ৬:৯-১২)

এই অবস্থা দেখে আল্লাহ নুহকে বললেন, "গোটা মানুষজাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোর-জুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার সবকিছু আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরি কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিবে। জাহাজটা তুমি এভাবে তৈরি করবে : সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতায় হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নিচে এক হাত পর্যন্ত চারদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের একপাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তলা থাকবে। আর দেখ, আমি দুনিয়াতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব, যাতে আসমানের নিচে যেসব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয় বেঁচে আছে, তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে। (পয়দায়েশ, ৬:১৩-১৭)

"কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করব। তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার স্ত্রী ও তোমাদের ছেলেদের স্ত্রীরা। তোমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক-এক জোড়া জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখি, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক-এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার; আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় ও মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার এবং তোমাদের খাবার।" নুহ তা-ই করলেন। আল্লাহর হুকুম মত তিনি সবকিছুই করলেন। (পয়দায়েশ, ৬:১৮-২২)

এরপরে মাবুদ নুহকে আবার বললেন, "তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে উঠবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনকার লোকদের মধ্যে কেবল তুমিই সৎ আছ। তুমি পাকপশুর প্রত্যেক জাতের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সঙ্গে নেবে, আর নাপাক পশুর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক জোড়া করে নেবে। দুনিয়ার উপর তাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তুমি তা করবে। আমি আর সাতদিন পরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করবো। তাতে চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে। আমি ভূমিতে যেসব প্রাণী সৃষ্টি

করেছি তাদের প্রত্যেকটিকে দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব।" মাবুদের হুকুম মতই নুহ সব কাজ করলেন। (পয়দায়েশ, ৭:১-৫)

মহাপ্লাবন সম্পর্কে তৌরাত শরিফে বর্ণিত আছে : দুনিয়াতে বন্যা শুরু হওয়ার সময় নুহের বয়স ছিল ছ'শো বছর। বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য নুহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা এবং ছেলেদের স্ত্রীরা সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। আল্লাহ নুহকে হুকুম দেবার সময় যা বলেছিলেন, সেইভাবে পাক ও নাপাক পশু, পাখি ও বুকে-হাঁটা প্রাণিরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে জোড়ায় জোড়ায় সেই জাহাজে নুহের কাছে গিয়ে উঠল। সেই সাতদিন পার হয়ে গেলে পর দুনিয়াতে বন্যা হল। নুহের বয়স যখন ছ'শো বছর চলছিল, সেই বছরের দ্বিতীয় মাসের সতের দিনের দিন মাটির নিচের সমস্ত পানি হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগলো আর আকাশেও যেন ফাটল ধরলো। চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত ধরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল। (পয়দায়েশ, ৭:৬-১২)

তারপর থেকে চল্লিশদিন ধরে দুনিয়াতে বন্যার পানি বেড়েই চলল। পানি বেড়ে যাওয়াতে জাহাজটা মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে উঠল। পরে দুনিয়ার উপরে পানি আরো বেড়ে গেল এবং জাহাজটা পানির উপরে ভাসতে লাগল। দুনিয়ার উপরে পানি কেবল বেড়েই চলল; ফলে যেখানে যত বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে পানি আরো পনের হাত উপরে উঠে গেল। এর ফলে মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রাণী, পাখি, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। শুকনা মাটির উপর যেসব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল। আল্লাহ এইভাবে ভূমির সমস্ত প্রাণী দুনিয়ার থেকে মুছে ফেললেন। তাতে মানুষ, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং আকাশের পাখি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে গেল। কেবল নুহ এবং তাঁর সঙ্গে যারা জাহাজে ছিলেন, তারা বেঁচে রইলেন। দুনিয়া একশো পঞ্চাশ দিন পানিতে ডুবে রইল। (পয়দায়েশ, ৭:১৭-২৪)

জাহাজে নুহ এবং তাঁর সঙ্গে যেসব গৃহপালিত ও বন্যপশু ছিল আল্লাহ তাদের কথা ভুলে যাননি। তিনি দুনিয়ার উপরে বাতাস বহালেন, তাতে পানি কমতে লাগল। এর আগেই মাটির নিচের সমস্ত পানি বের হওয়া এবং আকাশের সব ফাটল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল। তাতে মাটির উপরকার পানি সরে যেতে থাকল, আর বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন পর দেখা গেল পানি অনেক কমে গেছে। সপ্তম মাসের সতের দিনের দিন জাহাজটা আরারাতের পাহাড়শ্রেণির উপরে গিয়ে আটকে রইল। এরপরেও পানি কমে যেতে লাগল, আর দশম মাসের প্রথম দিনে পাহাড়শ্রেণির চূড়া দেখা দিল। (পয়দায়েশ, ৮:১-৫)

নুহের বয়স তখন ছ'শো একবছর চলছিল। সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনেই মাটির উপর থেকে পানি সরে গিয়েছিল। তখন নুহ জাহাজের ছাদ খুলে ফেলে তাকিয়ে দেখলেন যে, মাটির উপরটা শুকাতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনের মধ্যে মাটি একেবাওে শুকিয়ে গেল। তখন আল্লাহ নুহকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে, তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস, আর সেই সঙ্গে সমস্ত পশু-পাখি এবং বুকে হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ যত জীবজন্তু আছে তাদের সকলকেই বের করে নিয়ে এসো। আমি চাই যেন দুনিয়াতে তাদের বংশ অনেক বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে।" তখন নুহ, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁদের সঙ্গে সব পশু-পাখি এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী নিজের নিজের জাত অনুসারে বের হয়ে গেল। (পয়দায়েশ, ৮:১৩-১৯)

কোরান শরিফে হযরত নুহ্ (আঃ) এবং মহাপ্লাবণ সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য : ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ‘কোরান শরিফে’ হযরত নুহের নামে আটাশটি আয়াতসমৃদ্ধ ‘সুরা নুহ্’ নামের সুরা-ই (৭১ নম্বর) আছে; এই সুরাসহ আরো কয়েকটি সুরার বিভিন্ন আয়াতে হযরত নুহ্ এবং মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, সময়ে সময়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এই কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তবে তৌরাত শরিফের মত এতো বিস্তৃত পরিসরে নুহের জাহাজের বর্ণনা কিংবা মহাপ্লাবনের ব্যাপারে (যেমন, জাহাজের উচ্চতা-আয়তন-ধারণ সংখ্যা, প্লাবন কতদিন ছিল ইত্যাদি) বক্তব্য দেয়া হয়নি; শুধু পবিত্র কোরান শরিফেই নয়, তৌরাত শরিফ ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক উপাখ্যান কিংবা লোকগাঁথাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

যা হোক, হযরত নুহ্ ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত কিছু আয়াত বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের ‘কোরান শরিফ সরল বঙ্গানুবাদ’ থেকে পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল (সাথে-সাথে পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি আয়াতের ইংরেজিরূপ-ও দেয়া হল) : নিশ্চয়ই আমি নুহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, ‘আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভুল করতে দেখছি। (সুরা আ’রাফ, ৭:৫৯-৬০)

সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল। (সুরা আ’রাফ, ৭:৬১)

আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে সদুপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্র কাছ থেকে জানি। (সুরা আ’রাফ, ৭:৬২)

তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, আর যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। (সুরা আ’রাফ, ৭:৬৪)

তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, ‘তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করো, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও পৃথিবী প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া আর তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তাদেরকে ডোবানো হবে। (সুরা মুমিনুন, ২৩:২৭) So We inspired him (saying): "Construct the ship under Our Eyes and under Our Revelation (guidance). Then, when Our Command comes, and the oven gushes forth water, take on board of each kind two (male and female), and your family, except those thereof against whom the Word has already gone forth. And address Me not in favour of those who have done wrong. Verily, they are to be drowned. (Surah Al-Mu'minun, 23:27)

‘... তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ বানাও, আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না। তারা তো ডুববেই।’ (সুরা হুদ, ১১:৩৭)

সে জাহাজ বানাতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার কাছ দিয়ে যেত তারা তাকে ঠাট্টা করত। সে বলত, 'তোমরা যদি আমাদেরকে ঠাট্টা কর আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব যেমন তোমরা ঠাট্টা করছ। আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি আসবে, আর স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।' (সুরা হুদ, ১১:৩৮-৩৯)

অবশেষে আমার আদেশ এলে পৃথিবী প্লাবিত এঞ্চল। আমি বললাম, 'এর ওপর প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাতের বিরুদ্ধে আগেই স্থির করা হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল। (সুরা হুদ, ১১:৪০) (So it was) till then there came Our Command and the oven gushed forth (water like fountains from the earth). We said: "Embark therein, of each kind two (male and female), and your family, except him against whom the Word has already gone forth, and those who believe. And none believed with him, except a few." (Surah Hud, 11:44)

... পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাঝে এ তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল। নুহ্ তার পুত্র যে আলাদা ছিল তাকে ডেকে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে ওঠো আর অবিশ্বসীদের সাথে থেকো না।' (সুরা হুদ, ১১:৪২)

... এরপর বলা হল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও! আর হে আকাশ! থামো।' এরপর বন্যা প্রশমিত হল ও কাজ শেষ হল। নৌকা জুদি পাহাড়ের ওপর থামল; আর বলা হল 'ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম।' (সুরা হুদ, ১১:৪৪) And it was said: "O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold (your rain)." And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allâh) was fulfilled (i.e. the destruction of the people of Nûh (Noah). And it (the ship) rested on Mount Judi, and it was said: "Away with the people who are Zalimûn (polytheists and wrong-doing)!" (Surah Hud, 11:44)

... এরপর সুরা হুদের ৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত নুহ্, মহাপ্লাবন সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আর অগ্রসর হলাম না।

সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবন : হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মৎসপুরাণ' এবং 'শতপথ ব্রাহ্মণ' (চারটি বেদের মধ্যে একটি হচ্ছে যজুর্বেদ, যা দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তরীয় সংহিতা অন্যটি শুক্লযজুর্বেদ; এই শুক্লযজুর্বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ)-এ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে একটি অবতার হচ্ছে 'মৎস' বা মাছ অবতার (লক্ষ করার বিষয়, মৎসপুরাণ বা শতপথ ব্রাহ্মণেও মনুর নৌকা বা মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা নেই; আছে কিছুটা ঠাকুরমার ঝুলির কাহিনী!)। উক্ত দুটি ধর্মগ্রন্থে মৎস অবতার আবির্ভাবের যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত আছে, তা সংক্ষিপ্ত করে বললে—প্রথম মানব 'মনু' একবার এক জলাশয়ে হাত-পা ধৌত করতে গিয়ে ক্ষুদ্র একটি মাছ দেখতে পেলেন। ছোট ঐ মাছটি জলাশয়ের অন্যান্য রাক্ষুসে মাছ থেকে রক্ষা করার জন্য মনুর কাছে অনুরোধ জানালো। মনু তখন সেই মাছটিকে জলাশয় থেকে তুলে নিয়ে এসে 'নিরাপদ স্থান' হিসেবে জলভর্তি পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েকদিনের মাথায় মাছটি আকারে বড় হয়ে গেল যে পাত্রে রাখা যাচ্ছে না; মনু তখন মাছটিকে একটি জলাশয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুদিনের মাথায় মাছটি আরো বৃহৎ হয়ে গেল, জলাশয়েও আর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মনু মাছটিকে নিয়ে গেলেন পুকুরে, সেখান থেকে নদীতে। এরপরও মাছটি দিনদিন দীর্ঘ হতে লাগল, শেষমেশ স্থান সংকুলানের জন্য বাধ্য হয়ে নিয়ে যেতে হল সমুদ্রে। একদিন মনু সমুদ্রে গেলে, মাছটি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার পরিচয়

দিয়ে পাপ আর পঙ্কিলতায় ডুবে যাওয়া সমগ্র পৃথিবীতে মহাপ্লাবনের ব্যাপারে আগাম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দ্রুত একটি বৃহৎ নৌকা বানাতে নির্দেশ দিল; কারণ আসন্ন মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। মনু ফিরে এসে মাছটির কথামতো কাজ শুরু করে দিলেন। পরবর্তীতে ভগবান বিষ্ণুর ঘোষিত মহাপ্লাবন শুরু হলে সারা পৃথিবী তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যেতে লাগল; মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাছের নির্দেশ মত নৌকায় গিয়ে উঠলো, আর মৎসরূপী বিষ্ণু তখন নৌকাটির গুণ টেনে নিয়ে বিরাট পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেল। মহাপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছা পূর্ণ হলে আস্তে আস্তে প্লাবনের পানি কমতে লাগল। বন্যার পানি কমে গেলে পৃথিবী পুনঃনির্মাণের জন্য মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পাহাড় থেকে ভূমিতে নেমে এল, এবং পুনরায় পৃথিবীতে বংশবিস্তারের মাধ্যমে মানব প্রজাতি টিকিয়ে রাখল।

আরো কিছু বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী এবং লোকগাঁথা : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে চরিত্রের নামের ভিন্নতা আর কাহিনীর ছোট-খাট পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলেই এই প্লাবন বা মহাপ্লাবনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করে এরকম পাঁচটি লোকগাঁথার কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল : (১) রোমান পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে—দেবতাশিরোমনি জুপিটার একসময় প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন মানুষের নাফরমানি আর শয়তানি দেখে; সিদ্ধান্ত নিলেন ধ্বংস করে দিবেন তাঁরই সৃষ্ট এই জীবজগতকে। প্রথমে ঠিক করলেন আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে পৃথিবীকে, কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত বদল করে নিলেন; মহাপ্লাবনের পানিতে ভাসিয়ে-ডুবিয়ে হত্যা করা হবে সৃষ্টিকে। এজন্য দেবতা নেপচুনের সাহায্য নিলেন দুনিয়ায় ভয়ানক ভূমিকম্প-বজ্রপাতের মাধ্যমে মহাপ্লাবনের জোয়ার সৃষ্টি করতে; দেবতাশিরোমনির নির্দেশ দেবতা নেপচুনের কাছে শিরোধার্য। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হল ভয়ানক মহাপ্লাবন, বিশাল-বিশাল স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল সকল প্রাণ, ডুবে যেতে লাগল পৃথিবী। কিন্তু শেষমেশ ডুবলো না শুধু পানাস্সুস পাহাড়ের চূড়া। ভয়ঙ্কর ঐ প্লাবনের সময় নৌকা বানিয়ে স্রোতে ভেসে ভেসে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল প্রমিথিউয়াস পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং তার স্ত্রী পাইহা। আগে থেকেই তাদের সততা, নিষ্ঠায় মুগ্ধ ঈশ্বর জুপিটার। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হলে দুনিয়া থেকে বন্যার পানি কমিয়ে দিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ডিউকেলিয়ন ও পাইহা একদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে মাটিতে নেমে এলেন এবং দৈববাণী অনুসারে পৃথিবীতে পুনরায় বংশবিস্তার শুরু করলেন। (রোমান এই পৌরাণিক কাহিনীর সাথে গ্রিসের পৌরাণিক কাহিনীর লক্ষণীয় মিল রয়েছে, যেমন প্রমিথিউয়াস পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং পাইহা নামের চরিত্র গ্রিককাহিনীতেও রয়েছে, আর রোমান ঈশ্বর জুপিটারের বদলে ওখানে রয়েছে জিউস... ইত্যাদি।) (২) সুমেরিয়ান গল্পগাঁথা থেকে জানা যায়, ঈশ্বর একসময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে (মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়া ও আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত) মনুষ্যপ্রজাতিকে ধ্বংস করে দিতে মনস্থির করলেন; কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজা জিউসুদ্রের প্রতি প্রীত হয়ে দেবতা এনলিল আগত বন্যার ব্যাপারে রাজাকে আগেই সতর্ক করে দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন একটি বড়সড় জাহাজ বানানোর জন্য। রাজা জিউসুদ্র দেবতা এনলিলের পরামর্শ মতো কাজ শুরু করে দিলেন। একসময় এলো সেই ভয়ানক কালরাত্রি; চারিদিক থেকে শাঁ শাঁ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা বাতাস আর সাত দিন-সাত রাত ধরে অবিরাম বৃষ্টিতে এ ধরণী ডুবে গেল। বন্যার সময় জিউসুদ্র এবং তার পরিবারের সদস্যরা সদ্য তৈরি করা জাহাজ উঠে ভেসে বেড়াতে লাগলেন একস্থান থেকে অন্য স্থানে। জাহাজে বসে রাজা জিউসুদ্র সূর্যদেবতা উতুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন সূর্য উদয়ের জন্য, যাতে করে বৃষ্টি কমে গিয়ে বন্যার পানি নামতে শুরু করে। আস্তে আস্তে দেবতাদের ক্রোধ কমে এলে ধরণী থেকে বন্যার পানিও কমতে লাগল, আকাশে সূর্যের দেখাও মিলল। বন্যার পানি একদম কমে গেলে রাজা সবাইকে নিয়ে ভূমিতে নেমে এলেন, এবং দেবতাদ্বয় অনু ও এনলিলের সন্তুষ্টি কামনায় একটি ভেড়া ও ষাঁড় কোরবানি দিলেন (মহাপ্লাবনের পরে কোরবানি দেয়ার ঘটনাটি তৌরাত শরিফেও

উল্লেখ আছে, দেখুন : পয়দায়েশ, ৮:২০-২১)। (৩) আসামের লুসাই আদিবাসীদের লোকগাঁথায় রয়েছে, একবার জলের রাজা, যিনি আবার শয়তানদেবতা, নগাই-তি নামক এক অপূর্ব সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়ে গেলেন। শয়তানদেবতা তাঁর চিত্তহরণকারী নারীর কাছে প্রেমে নিবেদন করতে গেলে, নগাই-তি তা প্রত্যাখান করে বসে এবং পালিয়ে যায়। সাধারণ এক নারীর দুঃসাহস দেখে দেবতা খুবই অপমানিতবোধ করলেন, ক্ষুব্ধ হলেন, রাগান্বিত হলেন! মানবীর সাথে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে দেবতা নিজের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন; প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মানবজাতিকে 'ফান-লু-বুক' পাহাড়ে ঘেরাও করে ফেললেন, হুমকি দিলেন—নগাই-তিকে না পেলে সকলকে তিনি পানিতে ডুবিয়ে মারবেন! শয়তানদেবতার হুমকিতে ভীত হয়ে জনগণ আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নগাই-তিকে জোর করে বন্যার পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এরপরই দেবতার ক্রোধ কমে গেল এবং পাহাড়ের চারপাশ থেকে বন্যার পানি কমিয়ে দিলেন। (৪) চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ললোবাসীদের লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, স্বর্গের পিতা সিজুসিহ্ একজন মৃতমানুষের রক্ত ও কিছু মাংস নিয়ে আসার জন্য পৃথিবীতে একবার দূত প্রেরণ করলেন। দূতটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হল, কিন্তু একজন ব্যক্তি 'দুমু' শুধুমাত্র স্বর্গের পিতার কথা রক্ষা করলেন। পিতা পৃথিবীবাসীদের এই বেঈমানি দেখে খুবই দুঃখিত হলেন, সাথে-সাথে বাগান্বিতও হলেন। পৃথিবীবাসীকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিকে মারাত্মক প্লাবনের সৃষ্টি হল। মানুষ, প্রাণী সকলেই বন্যার পানিতে ভেসে যেতে লাগল, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দুমু, তাঁর চার ছেলে, কয়েকটি বুনো হাঁস ও ভোঁদরসহ একটি বড়সড়-লম্বা গাছে আশ্রয় নিল এবং স্বর্গের পিতার করুণায় বেঁচে গেল। আজকে যারা সভ্য বা লেখাপড়া জানে, তারা দুমুর ঐ চার সন্তানের বংশধর; আর যারা অশিক্ষিত বা সভ্যতার আলো পায়নি, তারা কাঠ দ্বারা নির্মিত মূর্তির বংশধর, যেগুলিকে দুমু ও তাঁর সন্তানেরা ভয়াবহ মহাপ্লাবরের পর কুড়িয়ে পেয়ে মেরামত করেছিল। (৫) পূর্ব আফ্রিকার মাসাইদের আঞ্চলিক লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, অনেককাল আগে মাসাইদের ওখানে টামবাইনোত নামে একজন সৎ-আদর্শবান ও ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করতেন। তার স্ত্রীর নাম নাইপান্দে এবং তাদের তিন সন্তানের নাম ওশমো, বার্তিমোরা ও বারমাও। একদিন টামবাইনোতের ভাই লেঙ্গারনি মারা গেলে স্থানীয় প্রথানুসারে তিনি মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। মৃত ভাইয়ের ঘরেও তিন সন্তান ছিল, ফলে ভাবীকে বিবাহের পর ঐ সন্তানগুলিও টামবাইনোতের সন্তান হয়ে যায়; অর্থাৎ নিজের তিন সন্তানসহ মোট ছয় সন্তানের পিতা হন টামবাইনোত। পৃথিবীতে সেসময় প্রচুর জনসংখ্যা ছিল; জনসংখ্যার ভারে পৃথিবী কম্পমান। কিন্তু জনসংখ্যা অধিক থাকলেও মানুষের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা-নীতি-ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বলতে কিচ্ছু ছিল না। হত্যা-ধ্বংস-দুর্নীতি-লুণ্ঠন-রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ-প্রবণতায় পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর মানুষের ঐ অধোগতি দেখে ব্যথিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন; মনঃস্থির করলেন ধ্বংস করে ফেলবেন এই মনুষ্যপ্রজাতিকে, সাথে বাকি জীবজগতকেও, সবকিছু নূতন করে গড়ে তুলবেন আবার। কিন্তু ঈশ্বর টামবাইনোতের সততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, তাকে নির্দেশ দিলেন কাঠ দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি করতে, যেখানে আশ্রয় নেবে টামবাইনোত, তার দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান, ছয় সন্তানের স্ত্রী, এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণী। টামবাইনোতের জাহাজ বানানো শেষ হলে, ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বৃষ্টির আদেশ দিলেন। একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিকে ভয়ানক বন্যা হয়ে হয়ে গেল; বন্যায় ডুবে যেতে লাগল বাকি সব মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি আর টামবাইনোত তার পরিবার নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। এক সময় বৃষ্টি থেমে গেলে, টামবাইনোত তার সঙ্গে থাকা একটি পায়রা উড়িয়ে দিলেন। বেশকিছুক্ষণ পর পায়রাটি ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল; টামবাইনোত বুঝতে পারলেন : পায়রাটি চারিদিকে কোথাও বসবার জন্য শুকনো স্থান না পেয়ে জাহাজে আবার ফিরে এসেছে। দিন কয়েক কেটে গেলে টামবাইনোত একটি শকুন উড়িয়ে দিলেন, তবে কৌশলে শকুনের পালকের সাথে একটি তীর আটকে দিলেন; যাতে শকুনটি কোথাও বসলে, তীরটি যেন ঐ স্থানে আটকে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে শকুনটি ফিরে এলেও পালকের সাথে আর তীর আটকে ছিল না। টামবাইনোত বুঝতে পারলেন শকুনটি কোনো নরম স্থানে বসেছিল, যেখানে তীরটি আটকে গেছে। আরো কিছুদিন পর বন্যার পানি একদম কমে গিয়ে মাটির

সমান হয়ে গেল। জাহাজটিও এক জায়গায় এসে আটকে গেল। তখন টামবাইনোত ও তার পরিবারের সদস্যরা ভূমিতে নেমে এসে আকাশে অপূর্ব সুন্দর রঙধনু দেখতে পেল। একে তারা ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করল।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান : বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত তৌরাত শরিফে (জেনেসিস অধ্যায়ে) হযরত আদম থেকে হযরত ইব্রাহিমের বয়সের তালিকা সরাসরি দেয়া আছে। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম থেকে যিশু খ্রিস্টের জন্ম অবধি এই সময়কালের সেরূপ কোনো তথ্য (জন্মলতিকা) সরাসরি দেয়া নেই। তবে প্রাচীন নানা ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে ১৬৫৪ সালে আয়ারল্যান্ডের ধর্মযাজক জেমস আসার (১৫৮১-১৬৫৬) 'অ্যানালাস অফ ওল্ড এন্ড নিউটেস্টামেন্ট' গ্রন্থে বাইবেলে উল্লিখিত আদম এবং তাঁর বংশধরদের জন্মলতিকা যোগ করে জানিয়েছিলেন—ঈশ্বর এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে, রবিবার সকাল নয় ঘটিকায়, অক্টোবরের ২৩ তারিখে; এর কিছুকাল পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জন লাইটফুট (১৬০২-১৬৭৫) নতুন গণনা করে জানালেন, আদমের জন্ম সকাল নয় ঘটিকায়, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে, এবং সেটা খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার সালেই। আবার বাইবেলে বর্ণিত 'মহাপ্লাবন' খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে হয়েছিল। এই দুই পণ্ডিতব্যক্তির সূক্ষ্ম দিনক্ষণের হিসাবকে বিশ্বের বেশিরভাগ ইহুদি এবং খ্রিস্টান সঠিক এবং এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে থাকেন।

বাংলা একাডেমীর ঐতিহাসিক অভিধান (মোহাম্মদ মতিউর রহমান সংকলিত, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩২৭) মতে, আদম পৃথিবীতে আসেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০৯ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭৯ সালে। হযরত আদম থেকে হযরত নুহের বয়সের ব্যবধান ১০৫৬ বছর। হযরত নুহের বয়স যখন ছয়শত বছর, তখন মহাপ্লাবন ঘটেছিল; অর্থাৎ আদম জন্মের ১৬৫৬ বছর পর (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে) মহাপ্লাবন হয়েছিল। এরপর অতিক্রান্ত হয়েছে, ২৩৪৮ + ২০০৮ = ৪৩৫৬ বছর; আর একটি বারের জন্যেও মহাপ্লাবন হয়নি (মানে দুর্নীতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধপ্রবণতা কমে গেছে, আর ঈশ্বরের প্রতি 'ঐকান্তিক বিশ্বাস' অটুট রয়েছে এখনও), কী অদ্ভুত!

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এবং পৌরাণিক লোকগাঁথায় মহাপ্লাবনের কাহিনী বর্ণিত আছে, তা থেকে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয় :
(১) মহাপ্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়ার মত আদৌ এতো বৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব?
(২) হযরত নুহের জাহাজে কি সত্যিই পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল?

এ দুটি প্রশ্নের উত্তর বের করার আগে পাঠকদের দুটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : (ক) আমাদের এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ তৌরাত শরিফকে বেছে নিয়েছি কারণ, তৌরাত শরিফের জেনেসিস অধ্যায়ে হযরত নুহের জীবনী, নুহের জাহাজের বর্ণনা, মহাপ্লাবন ইত্যাদি বিষয় যেরকম বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা পৌরাণিক লোকগাঁথাতে এরকম বর্ণনা নেই। স্পষ্ট করে বললে, ওগুলোতে যা আছে, তা খুবই ভাসা-ভাসা বা হালকা চালে লেখা; ফলে বাইবেল ব্যতিরেকে বাকি সকল ধর্মগ্রন্থের বাণী বা লোকগাঁথা থেকে 'তথ্য' নিয়ে মহাপ্লাবনের কাহিনীকে 'সত্য' প্রমাণ করা সম্ভব না (কারণ ওগুলোতে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য রয়েছে, যেমন একটি ধর্মগ্রন্থে 'মহাপ্লাবন'কে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় বন্যা বা প্লাবন হয়েছে বলে 'ইঙ্গিত' দিচ্ছে, আবার একই সাথে ঐ ধর্মগ্রন্থে সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়ে দেয়া এবং প্রতিটি প্রজাতি থেকে এক জোড়া করে প্রাণী সংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে!), কিংবা এ তথ্য সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোও সম্ভব না । (২) আমরা কোনোভাবেই স্থানীয় বন্যা বা প্লাবনকে অস্বীকার করছি না; বরং মনে করি, সেটি হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ প্রাচীনকালের সকল সভ্যতাই নদীর তীর ঘেষে গড়ে উঠেছে, উদাহরণ

হিসেবে বলা যায় নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ব্যবিলনীয় সভ্যতা এবং হাল আমলে আমলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আমাদের ঢাকাই সভ্যতা। নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা তৈরি হলে, সহজেই ধারণা করা যায়, স্থানীয়ভাবে বন্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়; এবং সে বন্যার সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রাচীনকালের মানুষকে বেশ আকর্ষণ করেছে। এ আকর্ষণের প্রভাব গিয়ে পড়েছে ঐ অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায়; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মগ্রন্থে, পৌরাণিক গল্পে, আঞ্চলিক লোকগাঁথায়।

এ বিষয়গুলো মাথা রেখেই আমরা আজকের এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র 'কথন' এবং 'অতিকথন' (স্থানীয় প্লাবনকে কল্পনার ফানুস দিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহাপ্লাবন বানানো, সমগ্র পৃথিবীকে সেই মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেয়া, এক জোড়া করে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি সংগ্রহ করে নৌকায় রাখা ইত্যাদি)-এর মধ্যবর্তী দূরত্বে আলো ফেলতে চাচ্ছি। আশা করি, পাঠক নিশ্চয়ই বিষযটি বুঝতে পারছেন। তাই আর দেরি না করে, উপরের দুটি প্রশ্নের সমাধান অংকের মাধ্যমে দেওয়া যাক :

(১) মহাপ্লাবন হওয়া কি সম্ভব : আমাদের এই পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে ৭,৯২৬ মাইল বা ১২,৭৫৬ কিলোমিটার; ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৬,৩৭০ কিলোমিটার। পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে প্রায় ১,০৮০ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার বা প্রায় ১,০৮২,৬৯৬,৯৩২,০০০ কিউবিক কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেবার মত এত জল কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই। তারপর সেই জল গেল কোথায়? সারা পৃথিবীর মাটিতে শুষে নেয়া সম্ভব নয় (বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল), আবার অন্য কোনো উপায়ে উবে যাওয়াও সম্ভব নয়। একমাত্র যে জায়গায় এই জল যেতে পারে, সেটা বায়ুমণ্ডল; অর্থাৎ এই জল বাস্প হয়ে যেতে পারে। তাহলে বায়ুমণ্ডলেই এখনো জলটা আছে? ধরে নিচ্ছি, যদি আকাশের সমস্ত বাস্প জমে জলবিন্দুতে রূপান্তরিত হয় ও পৃথিবীতে ঝরে পড়ে, তাহলে কী আবার আর একটি মহাপ্লাবন হয়ে সর্বোচ্চ পর্বতগুলিকেও ডুবিয়ে দেবে? মনে হয় না, আর কোনো মহাপ্লাবন হবে, কারণ ঈশ্বর যে নিষেধ করেছেন, আর কখনো বন্যা হয়ে সমস্ত প্রাণীজগতকে ধ্বংস করবে না (পয়দায়েশ, ৯.১৫)!

আবহবিদ্যার বই থেকে আমরা জানতে পারি, প্রতি বর্গমিটারের উপরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তাতে গড়পড়তা ১৮ কিলোগ্রাম জলীয়বাস্প থাকতে পারে, এবং ২৫ কিলোগ্রামের বেশি থাকতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের এই আদ্রতা ঘনীভূত হয়ে এক সঙ্গে যদি ঝরে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে জলের গভীরতা কতটুকু বৃদ্ধি পায়?

এক বর্গমিটার জায়গায় সবচেয়ে বেশি জল থাকতে পারে ২৫ কিলোগ্রাম বা ২৫,০০০ গ্রাম; এবং ২৫,০০০ গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘনসেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গমিটার বা ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটার জায়গার উপরের স্তরে। এখন জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলেই জলস্তরের গভীরতা পরিমাপ করা যাবে, যেমন, ২৫,০০০ ÷ ১০,০০০ = ২.৫ সেন্টিমিটার; অর্থাৎ মহাপ্লাবনে সবচেয়ে বেশি জল জমা হলে, তা হতে পারে ২.৫ সেন্টিমিটার গভীর বা পৃথিবীর সবজায়গায় গড়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেও মাত্র ২.৫ সেন্টিমিটার জমতে পারে। আবার এইটুকু উচ্চতায় জল জমা সম্ভব হতে পারে তখনই, যদি মাটি এই জল শুষে না নেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হযরত নুহের ঐ কথিত মহাপ্লাবনে সত্যিই ২.৫ সেন্টিমিটার থেকে বেশি জল জমা সম্ভব নয়।

কিন্তু বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২.৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়; কারণ সেসব ক্ষেত্রে জল বায়ুমণ্ডল থেকে সোজাসুজি শুধু সে জায়গায় পড়ে না, পাশাপাশি অন্যান্য জায়গা থেকেও বাতাস জল বয়ে আনে। কিন্তু তৌরাত শরিফের মতে (পয়দায়েশ, ৭:২০), মহাপ্লাবন একই সঙ্গে সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নিচে, সুতরাং তখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বাতাসের মাধ্যমে জল আসা সম্ভব ছিল না।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে প্লাবন যদি হয়েও থাকে, তাহলেও জল ২.৫ সেন্টিমিটারের বেশি উঠতে পারেনি। কিন্তু আমাদের হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০০ মিটার উঁচু। তৌরাত শরিফসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, আঞ্চলিক লোকগাঁথা এবং পৌরাণিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে, মহাপ্লাবনের ফলে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গিয়েছিল। এখন একটু কষ্ট করে, হিসেব করলেই বুঝা যাবে মহাপ্লাবনের এই জলের গভীরতাকে কতগুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছে?

৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০,০০০ সেন্টিমিটারকে (জলস্তরের গভীরতা) ২.৫ সেন্টিমিটার দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যায়, নাহ, খুব বেশি অতিরঞ্জন করা হয়নি, মাত্র ৩৫২,০০০ (তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার) গুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছিল! খুবই কম, তাই না?

যা হোক দেখা যাচ্ছে, কথিত ঐ 'প্লাবন' যদি হয়ে থাকেও, তাহলে ঠিক যাকে বৃষ্টি বলে, তা হয়নি; একটা ঝিরঝিরে বর্ষণ হয়েছে মাত্র। কেননা, চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত বিরামহীন বৃষ্টির ফলে (পয়দায়েশ, ৭:১২) যদি মাত্র ২৫ মিলিমিটার (২.৫ সেন্টিমিটার) জল জমে, তাহলে দৈনিক বৃষ্টির পরিমাণ হবে ০.৬২৫ মিলিমিটার। আমাদের এখানে শরৎকালে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় তাতেও ১০ মিলিমিটারের মত জল থাকে (প্রায় ২০ গুণ বেশি)!

(২) হযরত নুহের জাহাজ : দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ জাহাজে পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে কি জায়গা সম্ভব ছিল? তৌরাত শরিফ (পয়দায়েশ, ৬:১৫) মতে, জাহাজ ছিল তিনতলা, লম্বায় ৩০০ হাত, চওড়া ৫০ হাত আর উচ্চতা ৩০ হাত।

প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার লোকদের একহাত বলতে যে মাপ বোঝানো হত, তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার বা ০.৪৫ মিটার। তাহলে, জাহাজটি লম্বায় ছিল ৩০০ × ০.৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা; আর ৫০ × ০.৪৫ = ২২.৫ মিটার চওড়া। তাহলে, প্রতিটি মেঝের মাপ ছিল ১৩৫ × ২২.৫ = ৩০৩৭.৫ বর্গমিটার এবং তিনতলা মিলিয়ে জাহাজে মোট জায়গা ছিল ৩ × ৩০৩৭.৫ = ৯১১২.৫ বর্গমিটার।

পৃথিবীতে শুধু প্রাণিই আছে দশ রকম Phylum-এর (উদ্ভিদের কথা না হয় বাদ দেয়া হল), যেমন—(১) Protozoa (২) Porifera (৩) Coelenterata (৪) Platyhelminthes (৫) Nemathelminthes (৬) Annelida (৭) Arthopoda (৮) Mollusca (৯) Echinodermata (১০) Chordata

এখন দশ রকম ফাইলাম থেকে আমরা শুধুমাত্র একটা ফাইলামকে বেছে নিচ্ছি, Chordata বা মেরুদণ্ডী প্রাণী। এই মেরুদণ্ডী প্রাণিদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন : (১) পাখি, (২) মাছ, (৩) সরীসৃপ (৪)

উভচর (৫) স্তন্যপায়ী। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত ১,৭৫০,০০০ প্রজাতির প্রাণী আছে; এবং ধারণা করা হয় অনাবিস্কৃত রয়েছে ১৪,০০০,০০০ প্রজাতির প্রাণী। নিম্নে কিছু প্রাণির প্রজাতি-সংখ্যা তুলে ধরা হল :

স্তন্যপায়ী	৩৫০০
পাখি	১৩০০০
উভচর	১৪০০
সরীসৃপ	৩৫০০
পতঙ্গ	৩৬০,০০০
অঙুরিমাল বা Annelid	১৬০০০

এখন দেখি, ঐ জাহাজে কেবল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্যই জায়গা যথেষ্ট ছিল কি-না?

তৌরাত শরিফের বর্ণনা মতে (পয়দায়েশ, ৭:২৪), দুনিয়া ১৫০ দিন জলের নিচে ডুবে ছিল। তাহলে ঐ সময় স্তন্যপায়ীদের জন্যই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়নি, তাদের খাবারের জন্যও জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল; সাথে-সাথে হযরত নুহ, নুহের স্ত্রী, তাঁদের তিন সন্তান, তিন সন্তানের স্ত্রীদের জন্য জাযগাসহ তাঁদের খাবার-দাবার রাখতে হয়েছিল। জাহাজে প্রতি জোড়া স্তন্যপায়ীদের জন্য জায়গা ছিল, ৯১১২.৫ ÷ ৩৫০০ = ২.৬ বর্গমিটার।

নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যাপ্ত নয়। নুহের পরিবারের জন্য জায়গার দরকার হয়েছিল, তাঁদের নিজেদের খাদ্যের দরকার ছিল, প্রাণিদের খাঁচাগুলোকে ফাঁক-ফাঁক করে রাখতে হয়েছিল (স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তিমি, ডলফিন, হাতি, রাইনো, হিপ্পো, বাঘ, সিংহ, গরু, ছাগল, হাতি, জিরাফসহ বিশাল আকারের জীব-জন্তুরা রয়েছে), এসকল প্রাণিরও খাদ্যের দরকার ছিল। তৃণভোজ প্রাণিদের জন্য ঘাস-গাছ-গাছালি, মাংসাশি প্রাণিদের জন্য মাংসসহ খাদ্যেও স্টক কোথায় রাখা হবে? ছোট্ট একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোয়ালা নামক লেজবিহীন ছোট ভালুকের মত প্রাণিটির রোজ এক কেজি করে ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus) গাছের পাতা খায়, যা তার পুষ্টি ও পানির চাহিদা মিটিয়ে দেয়। ঐ জাহাজে তো শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণিদেরই পর্যাপ্ত জায়গা হচ্ছে না, আবার অন্যান্য প্রাণিসহ ১৫০ দিন চলার মত তাদের খাদ্যের স্টক কোথায় রাখা হবে?

মোদ্দা কথা, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবনের বর্ণনাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছে অংকের হিসাব; আসলে ওরকম কিছু ঘটাই অসম্ভব। যদি কিছু হয়ে থাকে তো, মনে হয় কোনো স্থানীয় বন্যা হতে পারে; বাকি বক্তব্যগুলি সব কল্পনা, বকওয়াস, অতিমাত্রায় অতিকথন ছাড়া আর কিছু নয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১, কিতাবুল মোকাদ্দস, ঢাকা।

(২) রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, ২০০৭, কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। এবং Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, & Dr. Muhammad Muhsin Khan. Interpretation of the Meaning of The Noble Quran. Download Facility provided by : www.road-to-heaven.com

(৩) সেন, নারায়ণ, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০। এবং আন্তর্জালিক (Internet) ঠিকানা : http://gpc.edu/~pgore/geology/geo102/age.htm
(৪) খান, বেনজীন, ২০০৩, দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৮।
(৫) ঘোষ, প্রবীর, ২০০৩, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০।
(৬) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/noahs_ark.html
(৭) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.indianchild.com/animal_kingdom.htm
(৮) বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে মহাপ্লাবনের আরো কাহিনী জানতে আন্তর্জালে দেখুন : http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html

---

অনন্ত বিজয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক। মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন।